ICDDR,B
CENTRE FOR HEALTH AND POPULATION RESEARCH

HSB
স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা

বর্ষ ১ সংখ্যা ৪ | আইএসএসএন ১৭২৯-৩৪৩এক্স | সেপ্টেম্বর ২০০৩

ভিতরে

৬ বাংলাদেশের শহরাঞ্চলের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৫ বছরের কম-বয়সী শিশুদের মধ্যে *হেমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জাই* টাইপ বি সংক্রমণের পর্যবেক্ষণ (১৯৯৯-২০০২)

৯ কক্সবাজার জেলার চকোরিয়ায় *প্লাসমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম*-এর ফলে ম্যালেরিয়া

১৩ সতর্কবার্তাঃ নানা প্রকার ওষুধ-প্রতিরোধী *শিগেল্লা ডিসেন্টারি* টাইপ ১ যদি সিপ্রোফ্লোক্সাসিন-প্রতিরোধী হয়ে ওঠে, তাহলে বাংলাদেশে রক্ত-আমাশয় মহামারী আকারে দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা

১৫ সর্বশেষ পর্যবেক্ষণ

১৮ ঘোষণা

আইসিডিডিআর,বি:
সেন্টার ফর হেলথ এ্যান্ড পপুলেশন রিসার্চ
জিপিও বক্স ১২৮
ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
www.icddrb.org

বাংলাদেশে এইচআইভি পর্যবেক্ষণ

বাংলাদেশে এইচআইভি সংক্রমণের সবচেয়ে ঝুঁকিবহুল জনগোষ্ঠিতে এইচআইভি সংক্রমণ নিরূপনের জন্য বাঞ্চারিক পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করা হয়। মধ্য-বাংলাদেশের একটি শহর এলাকায় এ-জনগোষ্ঠির ভিতর শিরায় মাদক গহণকারীদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের হার গত তিন বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০২ সালে এ-হার শতকরা ৪ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। এ-সময় পর্যন্ত অন্যান্য জনগোষ্ঠিতে এইচআইভি সংক্রমণের হার শতকরা এক ভাগে সীমাবদ্ধ থাকতে দেখা গেছে। আলোচ্য প্রতিবেদনের ফলাফল ইংগিত দেয়, বাংলাদেশে শিরায় মাদক গহণকারীদের মধ্যে এইচআইভি মহামারীর প্রবণতা বেশি।

১৯৯৮ সাল থেকে বাংলাদেশ সরকার রক্ত পরীক্ষা এবং আচরণগত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এইচআইভি সংক্রমণ পর্যবেক্ষণ কর্মসূচি চালিয়ে আসছে, যা 'দ্বিতীয়-পজন্ম পযবেক্ষণ' নামে পরিচিত (১-৫)। বাংলাদেশে মহামারীর আশঙ্কার ওপর ভিত্তি করে এ-মহামারীকে কম আশঙ্কাজনক, ঘনীভূত, সাধারণ শ্রেণীভুক্ত এবং নমুনা জনসংখ্যার মধ্যে সীমিত—এভাবে শ্রেণীবিন্যাস করে এইচআইভি-এর সম্ভাব্য বৈচিত্র্য বঝার নিমিত্তে 'দ্বিতীয়-পজন্ম পযবেক্ষণ' কমসূচি চালু হয়েছে। এইচআইভি সংক্রমণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত কম ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য প্রতিবেদনের ফলাফল থেকে বোঝা যায়, বাংলাদেশ 'ঘনীভূত মহামারী'-এর তালিকাভুক্ত হওয়ার দিকে এগুচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে চার রাউন্ড পর্যবেক্ষণ কাজের প্রতিবার আইসিডিডিআর,বি রক্ত পরীক্ষার কাজটি সম্পাদন করেছে এবং অন্যান্য সংস্থা আচরণগত পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করেছে।

এইচআইভি সংক্রমণের সবচেয়ে ঝুঁকিবহুল জনগোষ্ঠির ওপর পর্যবেক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়। এদের মধ্যে রয়েছে পুরুষ ও মহিলা যৌনকর্মী হিজড়া, শিরায় মাদক গহণকারী লোকজন, পরুষ সমকামী, যৌনকর্মীদের খদ্দের যারা 'বাবু' নামে পরিচিত এবং পতিতালয়ের মহিলা যৌনকর্মীদের নিয়মিত সংগী, যৌনরোগের লক্ষণধারী সংক্রামিত রোগী এবং ট্রাক-চালক ও তাদের সহকারী, রিক্সাওয়ালা এবং লঞ্চের ডেককর্মী/খালাসীসহ পরিবহন শ্রমিকেরা। দেশের পাঁচটি বিভাগীয় অঞ্চল থেকে উল্লিখিত জনগোষ্ঠির নির্বাচিত লোকজনকে পরীক্ষার জন্য বাছাই করা হয়। সংশ্লিষ্ট কর্মসূচিতে নিয়োজিত সংস্থাসমূহের মাধ্যমে

সারণী ১: পর্যবেক্ষণের চতুর্থ রাউন্ডে প্রাপ্ত এইচআইভি এবং সিফিলিসের হার

জরিপকৃত জনসংখ্যা ভৌগলিক অবস্থান (মোট পরীক্ষিত সংখ্যা)	এইচআইভি পজিটিভ %; ৯৫% নির্ভরযোগ্যতা	সিফিলিস পজিটিভ %; ৯৫% নির্ভরযোগ্যতা	
		সক্রিয় নয়	সক্রিয়
শিরায় মাদকগ্রহণকারীঃ			
এনইপি* মধ্যাঞ্চল এ (৪০৩)	৪.০; ২.৩-৬.৪	১৯.৪; ১৫.৬-২৩.৬	৩.৫; ১.৯-৫.৮
এনইপি উত্তর-পশ্চিম এ (৪০৫)	০; ০-০.৯	৯.৪; ৬.৭-১২.৭	১.৭; ০.৭-৩.৫
এনইপি উত্তর-পশ্চিম বি (২০০)	০; ০-১.৮	১১.০; ৭.০-১৬.২	২.০; ০.৫-৫.০
হিরোইন সেবকঃ			
মধ্যাঞ্চল এ (৩৮৮)	০; ০-০.৯	১৩.৯; ১০.৬-১৭.৮	৩.৪; ১.৮-৫.৭
পতিতালয়ভিত্তিক মহিলা যৌনকর্মী			
মধ্যাঞ্চল বি (৪০৬)	০.২; ০-১.৪	২৩.২; ১৯.১-২৭.৬	৩.৯; ২.৩-৬.৩
মধ্যাঞ্চল সি (১৫২)	০; ০-২.৪	৪০.১; ৩২.৩-৪৮.৪	৯.২; ৫.১-১৫.০
মধ্যাঞ্চল ডি (৪০২)	০.৭; ০-২.২	৩২.৬; ২৮.০-৩৭.৪	৬.৭; ৪.৫-৯.৬
দক্ষিণ-পশ্চিম এ, সি (২৪১)	০; ০-১.৫	১৭.৪; ১২.৯-২২.৮	৫.০; ২.৬-৮.৫
দক্ষিণ-পশ্চিম বি (১৯৫)	০.৫; ০-২.৮	২৬.২; ২০.১-৩২.৯	৩.৬; ১.৫-৭.৩
ভ্রাম্যমান মহিলা যৌনকর্মী			
মধ্যাঞ্চল এ (৪০৩)	০.২; ০-১.৪	২৯.৮; ২৫.৪-৩৪.৫	৮.৪; ৫.৯-১১.৬
মধ্যাঞ্চল বি (১৯৯)	০; ০-১.৮	১২.১; ৭.৯-১৭.৪	৩.০; ১.১-৬.৪
দক্ষিণ-পশ্চিম এ** (৩১৭)	০; ০-১.২	১৩.৬; ১০.০-১৭.৮	৪.৭; ২.৭-৭.৭
হোটেলভিত্তিক মহিলা যৌনকর্মী			
মধ্যাঞ্চল এ (৪০৫)	০.২; ০-১.৪	১১.৪; ৮.৪-১৪.৯	৪.৯; ৩-৭.৫
হিজড়াঃ মধ্যাঞ্চল এ (৩৯৩)	০.৮; ০.২-২.২	৩৪.৯; ৩০.২-৩৯.৮	১০.৪; ৭.৬-১৩.৯
পুরুষ যৌনকর্মী			
মধ্যাঞ্চল এ (৪০১)	০; ০-০.৯	১৪.২; ১০.৯-১৮.০	৩.২; ১.৭-৫.৫
পুরুষ সমকামী (যৌনকর্মী নয়)ঃ			
মধ্যাঞ্চল এ (৪০৬)	০.২; ০-১.৪	৩.৭; ২.১-৬.০	০.৭; ০.২-২.১
পুরুষ সমকামী গ্রুপ (যৌনকর্মী এবং যৌনকর্মী নয় ***)ঃ			
মধ্যাঞ্চল সি (৪০০)	০; ০-০.৯	৮.৮; ৬.২-১২.০	২.৩; ১.০-৪.২
দক্ষিণ-পূর্ব এ (৩৯৭)	০; ০-০.৯	১১.৮; ৮.৮-১৫.৪	৪.৩; ২.৫-৬.৮
উত্তর-পূর্ব এ (৪০২)	০; ০-০.৯	৬.২; ৪.১-৯.০	৩.০; ১.৬-৫.২
বাবু (পতিতালয়)ঃ			
মধ্যাঞ্চল বি (২৫২)	০; ০-১.৫	১০.৭; ৭.২-১৫.২	১.৬; ০.৪-৪.০
মধ্যাঞ্চল ডি (২০০)	০; ০-১.৮	২৩.০; ১৭.৪-২৯.৫	৬.০; ৩.১-১০.২
যৌনরোগীঃ			
উত্তর-পূর্ব এ (১০৬)	০; ০-৩.৪	৩.৮; ১.০-৯.৪	০.৯; ০-৫.১
ট্রাক-চালক ও তাদের সহকারীঃ			
মধ্যাঞ্চল এ (৪০২)	০; ০-০.৯	৭.০; ৪.৭-৯.৯	১.০; ০.৩-২.৫
লঞ্চকর্মীঃ			
মধ্যাঞ্চল এ (৪০২)	০; ০-০.৯	৫.০; ৩.১-৭.৬	১.৫; ০.৫-৩.২
মোট (৭,৮৭৭)	**০.৩; ০.২-০.৫**	**১৫.৮; ১৫.০-১৬.৬**	**৩.৯; ৩.৫-৪.৪**

* এনইপি = নিডল/সিরিঞ্জ এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম

** দক্ষিণ-পশ্চিম এ এবং সি দু'টি ভৌগলিক সম্পর্কযুক্ত এলাকা যা সম্মিলিতভাবে একটি এলাকার প্রতিনিধিত্ব করছে

*** কিছু কিছু এলাকায় পুরুষ যৌনকর্মী এবং যৌনকর্মী নয় এমন পুরুষ সমকামীদেরকে আলাদা করা যায় নি এবং তাদেরকে একই গ্রুপের নমুনা হিসেবে ধরা হয়েছে

চিহ্নিত ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠিতে পরীক্ষার জন্য লোক বাছাই করে রক্ত পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করা হয়। তবে যেসমস্ত স্থানে হাসপাতাল, ক্লিনিক বা অন্য চিকিৎসা কেন্দ্র আছে শুধুমাত্র সেসব স্থানে লোকজনকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে এইচআইভি, সিফিলিস এবং হেপাটাইটিস সি পরীক্ষা করা হয়েছে। হেপাটাইটিস সি পরীক্ষা করা হয়েছে শুধুমাত্র যারা শিরায় মাদক গ্রহণ করে তাদের বেলায়। শতকরা কম-বেশি একভাগ (±১%) সুক্ষ্মতা এবং ৯৫% নির্ভরযোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রত্যেক শ্রেণী থেকে প্রায় ৩৮০ জন লোককে পরীক্ষা করা হয়। শতকরা একজন এইচআইভি আক্রান্ত হতে পারে এরূপ পূর্ব-ধারণার ভিত্তিতে তা করা হয়। যেখানে ৩৮০ জনের কম লোক পরাক্ষার জন্য পাওয়া গেছে সেখানে অংশগহণকারীদের সম্মতির ভিত্তিতে পত্যেককে পরীক্ষা করা হয়েছে।

২০০৩ সালের মে-অক্টোবর সময়ের মধ্যে রক্ত পরীক্ষার পর্যবেক্ষণের চতুর্থ রাউন্ডে ৭,৮৭৭টি রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। একটি এলিসা কিটের (অর্গানন, টেকনিকা, বক্সটেল, নেদারল্যান্ডস) মাধ্যমে পার্থমিক পর্যায়ে নমনাগুলোর এইচআইভি পরীক্ষা করে পজিটিভগুলোকে লাইন ইমিউনোএ্যাসে (এলআইএ, অর্গানন টেকনিকা) দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে। এলআইএ পরীক্ষা দ্বারা অনির্ণীত ফলাফলকে নেগেটিভ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। সিফিলিস পরীক্ষা করা হয়েছে র‍্যাপিড প্লাজমা রিয়াজিন পরীক্ষা পদ্ধতি (আরপিআর, অর্গানন, টেকনিকা) এবং ট্রিপোনেমা প্যালিডাম হেমোগ্লুটিনেশন এ্যাসে (টিপিএইচএ, অর্গানন, টেকনিকা)-এর মাধ্যমে। আট অথবা এর থেকে বেশি আরপিআর টাইটারসমৃদ্ধ টিপিএইচএ-পজিটিভ নমুনাগুলোকে সক্রিয় সিফিলিস হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এলিসা কিটের (ইউবিআই, এইচসিভি, ইআইএ, ইউনাইটেড বায়োমেডিক্যাল ইনক, ইউএসএ) সাহায্যে হেপাটাইটিস সি পরীক্ষা করার জন্য শিরায় মাদক গ্রহণকারীদের রক্ত পরীক্ষা করা হয়েছে। সবগুলো হেপাটাইটিস সি-এর এলিসা-পজিটিভ নমুনা দ্বিতীয় একটি এলিসা কিটের (এবডট আইএমএক্স এইচসিভি ভার্সান ৩.০, এবডট ল্যাব, ইউএসএ) মাধ্যমে পুনর্বার পরীক্ষা করা হয়েছে। অসামঞ্জস্যপূর্ণ ফলাফলসমৃদ্ধ নমুনাগুলো এলআইএ দ্বারা পুনরায় পরীক্ষা করা হয়েছে (ইএনএনও-এলআইএ এইচসিভি এ্যাব থ্রি আপডেট, ইনোজেনেটিক্স এর্নাভ, ঘেন্ট, বেলজিয়াম)। যেকোনো দু'টো পরীক্ষায় যে-নমনাগুলো পজিটিভ পাওয়া গেছে সেগুলোকেই হেপাটাইটিস সি-পজিটিভ হিসেবে ধরা হয়েছে।

মোটের ওপর শতকরা ০.৩ ভাগ এইচআইভি-এর প্রাদুর্ভাব দেখা গেছে (সারণী ১)। এই ফলাফল পূর্বের রাউন্ডগুলো থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের সাথে তুল্য (০.৪%, ০.২% এবং ০.২% যথাক্রমে ১ম, ২য় এবং ৩য় রাউন্ডে)। তবে এইচআইভি-র প্রাদুর্ভাব বাংলাদেশের কেন্দ্রে অবস্থিত একটি শহরে ('এ' চিহ্নিত শহর) শিরায় নেশাদ্রব্য গ্রহণকারীদের মধ্যে নাটকীয়ভাবে বেড়ে শতকরা ৪ ভাগে উন্নীত হয়েছে (চিত্র ১)। যেকোনো পর্যবেক্ষণ রাউন্ডের মধ্যে এই হারই সর্বোচ্চ রেকর্ড। শিরায় মাদক গ্রহণকারীদের মধ্যে হেপাটাইটিস সি-এর হারও অনেক বেশি (৫৯.৮%-৭৯.৫%), যা দ্বিতীয় পর্যবেক্ষণ রাউন্ডের ফলাফলের অনুরূপ (সারণী ২)।

চিত্র ১: বাংলাদেশে ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহণকারীদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণ

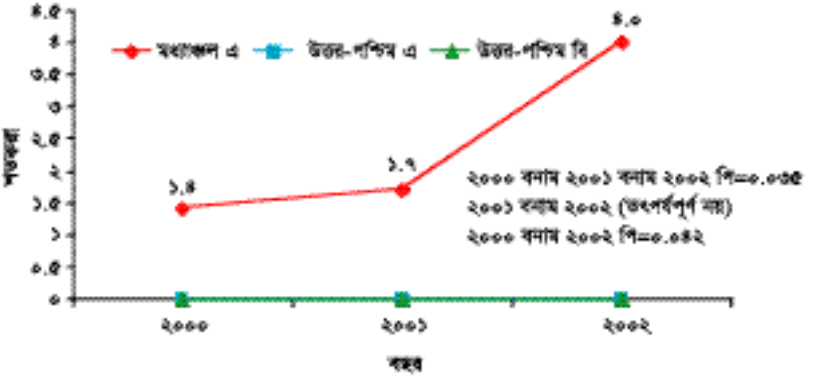

সারণী ২: ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহণকারীদের মধ্যে হেপাটাইটিস সি-এর হার

হেপাটাইটিস সি-পজিটিভ, % পজিটিভ, (৯৫% নির্ভরযোগ্যতা), (মোট পরীক্ষিত লোকসংখ্যা)			
বিভিন্ন স্থানের মাদকসেবী	রাউন্ড ২	রাউন্ড ৪	পি মান**
বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চলস্থ ডিটক্সিফিকেশন ক্লিনিকে অবস্থানরত	১৭.৪ (১৩.৯-২১.৫) (৪০২)	পরীক্ষা করা হয়নি	-
বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চলস্থ এনইপিভুক্ত*	৬৬.৫ (৬১.৮-৭১.০) (৪১৮)	৬২.৩ (৫৭.৪-৬৭.০) (৪০৩)	তাৎপর্যপূর্ণ নয়
উত্তর-পশ্চিম এ অঞ্চলস্থ এনইপিভুক্ত*	৫৯.৬ (৫৪.৭-৬৪.৮) (৪১৬)	৫৯.৮ (৫৪.৮-৬৪.৬) (৪০৫)	তাৎপর্যপূর্ণ নয়
উত্তর-পশ্চিম বি অঞ্চলস্থ এনইপিভুক্ত*	পরীক্ষা করা হয় নি	৭৯.৫ (৭৩.২-৮৪.৯) (২০০)	-

**এনইপি = নিডল/সিরিঞ্জ এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম*

***পি-মান = রাউন্ডসমূহের মধ্যে তুলনার জন্য কাই-স্কয়ার পরিসংখ্যান ব্যবহার করা হয়েছে*

অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠিতে এইচআইভি সংক্রমণের প্রাদুর্ভাব ছিলো শতকরা এক ভাগেরও কম। পুরুষ যৌনকর্মী অথবা মহিলা যৌনকর্মীর পুরুষ সংগীর কারো মধ্যে (ট্রাক-চালক ও সাহায্যকারী, লঞ্চকর্মী, যৌনরোগী এবং বাবু) এইচআইভির লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় নি।

মহিলা যৌনকর্মী এবং হিজড়াদের মধ্যে সিফিলিসের হার আগের মতই সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে (সারণী ১)। তবে বেশকিছু পতিতালয়ে এবং 'এ' চিহ্নিত শহরের ভাসমান পতিতাদের মধে সিফিলিসের হার নিম্নগামী দেখা গেছে (চিত্র ২)। সম্ভবত উক্ত এলাকাসমূহে নিবিড় নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের ফলে এটা সম্ভব হয়েছে।

চিত্র ২: পর্যবেক্ষণের চার রাউন্ডে প্রাপ্ত পতিতালয়ভিত্তিক মহিলা যৌনকর্মীদের মধ্যে সক্রিয় সিফিলিসের হার

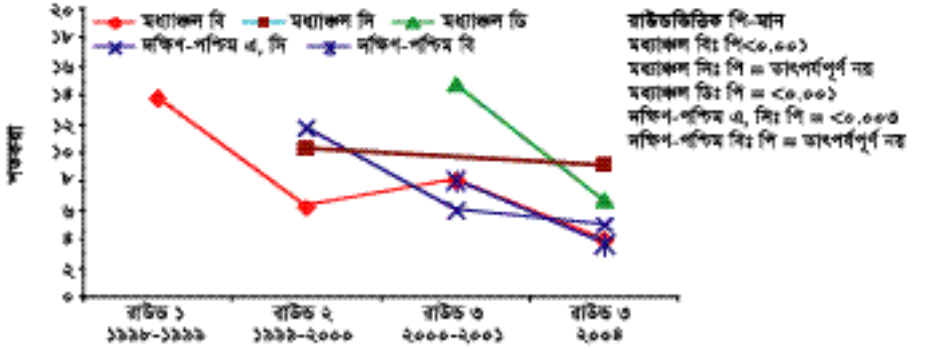

তথ্যসূত্র: হেলথ সিস্টেমস্ এন্ড ইনফেকশাস ডিজিজেজ ডিভিশন এবং ল্যাবরেটরি সাইন্সেস ডিভিশন, আইসিডিডিআর,বি

অর্থানুকূল্য: বাংলাদেশ সরকার, সহযোগিতায়ঃ ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভলপমেন্ট (ডিএফআইডি), যুক্তরাজ্য এবং বিশ্ব ব্যাংক

মন্তব্য

বাংলাদেশ কয়েক বছর ধরে এইচআইভি-র ওপর 'দ্বিতীয়-প্রজন্ম পর্যবেক্ষণ' নামে এক পর্যবেক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে এবং রক্ত পরীক্ষা ও আচরণগত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জাতীয়-পর্যায়ে মহামারীর ঝুঁকির ওপর তথ্য সরবরাহ করে আসছে (৬)। পর্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া উপাত্ত নীতি-নির্ধারক এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এধরনের কার্যক্রম চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ ও তার যথাযথ ব্যবহারের জন্যও ব্যবহৃত হচ্ছে (৭)। রক্ত পরীক্ষার পর্যবেক্ষণ থেকে বোঝা যাচ্ছে, বাংলাদেশে ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহণকারীদের মধ্যে একটি মহামারী আসন্ন। এশিয়ার অনেক দেশ থেকেই উক্ত শ্রেণীর লোকের মধ্যে মহামারীর খবর পাওয়া যাচ্ছে (৮)। আচরণগত পর্যবেক্ষণ থেকে বোঝা যায় যে, বাংলাদেশের কেন্দ্রে অবস্থিত এই শ্রেণীর শতকরা ৫০ জনেরও বেশি লোকের কোনো নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার সুযোগ নেই (৫)। সুঁচ/সিরিঞ্জ আদান-প্রদান কর্মসূচির (এনইপি) আওতাভুক্ত কিছু মাদকসেবী নিজেদের মধ্যে সুঁচ এবং সিরিঞ্জ আদান-প্রদান করে, যদিও তাদের মধ্যে ইনজেকশন ভাগাভাগির হার নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের আওতা-বহির্ভূত এলাকার মাদকসেবীদের থেকে অনেক কম (৫,৯)। যেহেতু রক্ত পরীক্ষার পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম শুধমাত্র সূচ/সিরিঞ্জ আদান-পদান কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী মাদকসেবীদের মধ্যে পরিচালিত, তাই নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের আওতা-বহির্ভূত মাদকসেবীদের মধ্যে এইচআইভি মহামারী এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে বলে ধারণা করা যায়। একবার যখন ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদকসেবী কোনো জনগোষ্ঠির মধ্যে এইচআইভি মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয়, তখন তা আর ঐ নির্দিষ্ট গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, যার প্রমাণ পওয়া গেছে অন্যান্য দেশের ঘটনায় (১০)। আচরণগত পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, উক্ত শ্রেণীভুক্ত জনগণ যৌনতা ক্রয় এবং বিক্রয় উভয় কাজে লিপ্ত। তাদের অনেকে বিবাহিত এবং খুব কমসংখ্যক লোকই কনডম ব্যবহার করে (২-৫)। এ-শ্রেণীর জনগণের মধ্যে সিফিলিস সংক্রমণের হার তুলনামূলকভাবে বেশি বলে নিশ্চিত বোঝা যায় যে, তারা নিরাপত্তাহীন যৌনকর্মে অভ্যস্থ।

বাংলাদেশের যৌনকর্মীদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের হার এখনও কম। তবে তারা মহামারীর উচ্চ ঝুঁকির মধ্যে আছে, কারণ তাদের সংগীর সংখ্যা অনেক বেশি এবং তারা কনডম ব্যবহারে কম অভ্যস্থ (২-৫)। মহিলা যৌনকর্মীদের মধ্যে সিফিলিসের হার সবচেয়ে বেশি (১-৫)। রক্ত পরীক্ষার পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম যেহেতু প্রচলিত নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো, সেহেতু সিফিলিস সংক্রমণের হারের এ-পরিবর্তন থেকে উক্ত কার্যক্রমের সফলতা বা ব্যর্থতা অনেকটাই বোঝা যায়।

হিজড়ারা হচ্ছে এইচআইভি-র জন্য ঝুঁকিপূর্ণ (প্রমাণিত) প্রান্তিক জনগোষ্ঠি (৪,৫)। পর্যবেক্ষণের চতুর্থ রাউন্ডে সক্রিয়-সিফিলিসের সর্বোচ্চ হার রেকর্ড করা হয়েছে এ-জনগোষ্ঠির মধ্যে। হিজড়াদের ওপর পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। তবে প্রাথমিকভাবে তা মাত্র একটি শহরে সীমাবদ্ধ। অন্য যেসব জনগোষ্ঠিতে সমীক্ষা চালানো হয়েছে সেসব স্থানেও উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ লক্ষ করা গেছে (২-৫)। যদি কোনো একটি শ্রেণীর জনগোষ্ঠিতে এ-রোগ মহামারী আকারে দেখা দেয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর সঙ্গে অন্য শ্রেণীর যোগাযোগের ফলে সৃষ্ট ঝুঁকি এ-রোগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা বাড়িয়ে দেবে।

ঘনীভূত একটা মহামারী প্রতিহত করার জন্য বাংলাদেশের হাতে খুব কম সময়ই আছে। সুতরাং সর্বস্তরের লোকের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সরাসরি কার্যক্রমের পরিধি বর্ধিতকরণ একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশে এইচআইভি-র প্রাদুর্ভাবের সম্ভাবনা কম থাকা সত্ত্বেও অনেকগুলো সংস্থা বহুদিন ধরে এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এই রাউন্ডের পর্যবেক্ষণের ফলাফলের ওপর নির্ভর করে বলা যায় যে, শিরায় মাদক গ্রহণকারী এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠিতে আর যাতে এইচআইভি সংক্রমণ না ছড়ায় তার জন্য যথাযথ কার্যক্রমের পরিধি আরো বাড়ানো অত্যন্ত জরুরী।

বি: দ্র: তথ্যনির্দেশের জন্য ইংরেজি সংস্করণ দেখুন

বাংলাদেশের শহরাঞ্চলের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৫ বছরের কম-বয়সী শিশুদের মধ্যে *হেমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জাই* টাইপ বি সংক্রমণের পর্যবেক্ষণ (১৯৯৯-২০০২)

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নিউমোনিয়া এবং মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত ৫ বছরের কম-বয়সী শিশুদের মধ্যে *হেমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জাই* টাইপ বি (হিব) সংক্রমণের রোগতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং এর জীবাণুনাশক-সংক্রান্ত প্রতিরোধ-ক্ষমতা নির্ধারণের জন্য ১৯৯৯ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত ঢাকায় এক পর্যবেক্ষণ চালানো হয়। এতে তেপ্পান্ন জন রোগীর মধ্যে হিব সংক্রমণ পরিলক্ষিত হয়েছে । রোগীর অস্থি-মজ্জা (সিএসএফ) পরীক্ষার মাধ্যমে এদের ৩৫ জনকে পাওয়া গেছে ম্যানিনজাইটিসে আক্রান্ত এবং রক্ত কালচারের মাধ্যমে ১৮ জনকে পাওয়া গে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত। অধিকাংশ হিব ম্যানিনজাইটিস এবং নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত রোগী ছিলো ৪ থেকে ১২ মাস-বয়সী শিশু। ট্রাইমেথোপ্রিম-সালফামেথোক্সাজোল, এ্যাম্পিসিলিন, ইরিথ্রোমাইসিন এবং ক্লোরামফেনিকলের জীবাণুনাশকের প্রতি সংবেদনশীলতা প্রায়শই কম দেখা গেছে। এভাবে হিব-এর ওষুধ-প্রতিরোধ ক্ষমতার উত্থা এবং ব্যাপ্তি এর চিকিৎসা অধিকতর জটিল এবং ব্যয়সাপেক্ষ করে তুলবে। ফলে বাংলাদেশে টিকাদানের মাধ্যমে এ-রোগের বিস্তার রোধের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

যেসব দেশে শিশুদের *হেমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জাই* টাইপ বি (হিব)-প্রতিষেধক টিকা দেওয়া হয় না, সেসব দেশে ৫ বছরের কম-বয়সী শিশুদের ম্যানিনজাইটিস, সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে সংক্রামিত হতে পারে তেমন নিউমোনিয়া এবং সেপ্টিসেমিয়া রোগের অন্যতম কারণ হিব (১-২)। এশিয়া মহাদেশে হিবজনিত রোগের ওপর সীমিত উপাত্ত রয়েছে (৩)। হিব দ্বারা সংঘটিত ম্যানিনজাইটিস, নিউমোনিয়া এবং সেপ্টিসেমিয়ার মত অত্যন্ত আক্রমণাত্মক রোগের জীবাণু সনাক্তকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান ল্যাবরেটরিগুলোতে সহজলভ্য নয়।

উন্নয়নশীল দেশসমূহে হিবজনিত রোগের মাত্রা নিরূপণ এবং এসব রোগ দমনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষেধক টিকার উপযোগিতা নির্ণয় করার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ঐসব দেশে হিব পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার সুপারিশ করেছে (২,৪)। ১৯৯৯-২০০২ সালে ঢাকা শহরের তিনটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নিউমোনিয়া, ম্যানিনজাইটিস ও সেপ্টিসেমিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে পরিচালিত হিব পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের সারাংশ এ-প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশকৃত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শিশুদের নিউমোনিয়া পরীক্ষা করা হয়েছে । ২ থেকে ১১ মাস বয়সের শিশুদের কাশি, শ্বাসকষ্ট এবং শ্বাস-প্রশ্বাস প্রতি মিনিটে ৫০ বার বা ততোধিক হলে, অথবা ১২ থেকে ৫৯ মাসের শিশুদের ক্ষেত্রে ৪০ বার বা ততোধিক হলে তাকে নিউমোনিয়া হিসেবে সনাক্ত করা হয়েছে। অবসাদ, অজ্ঞান হয়ে-যাওয়া, মাথার তালু ফুলে-যাওয়া এবং ঘাড় শক্ত হয়ে-যাওয়াসহ ম্যানিনজাইটিসের বিভিন্ন উপসর্গসম্বলিত ২৬১ জন শিশুর অস্থি-মজ্জ সংগ্রহ করে গ্রাম স্টেইন, সাইটোলজি এবং বায়োকেমিক্যাল টেস্টের মাধ্যমে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করা হয়। নিউমোনিয়া অথবা ম্যানিনজাইটিসের সুস্পষ্ট লক্ষণসম্বলিত ১,৫৭৫ জন শিশুর রক্ত কালচার করা হয়। এদের ১,৩১৪ জনের মধ্যে নিউমোনিয়া এবং ২৬১ জনের মধ্যে ম্যানিনজাইটিসের লক্ষণ সুস্পষ্ট ছিলো।

৬৫ জন শিশুর মধ্যে *এইচ. ইনফ্লুয়েঞ্জাই* সনাক্ত করা হয়েছে। এদের ৫৩ (৮১.৫%) জনের মধ্যে হিবের জীবাণু পাওয়া গেছে, যাদের ১৮ জন নিউমোনিয়ায় এবং ৩৫ জন ম্যানিনজাইটিসে আক্রান্ত ছিলো। বেশিরভাগ (৮৯%) হিব-আক্রান্ত শিশু ছিলো ৪-১২ মাস বয়সী। হিব জীবাণুঘটিত নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত ৪টি (২২%) শিশু এবং হিব ম্যানিনজাইটিসে আক্রান্ত ৬টি (১৬%) শিশু মারা গেছে।

হাসপাতালে চিকিৎসা এবং কালচারের জন্য রক্ত সংগ্রহের আগেই নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত শতকরা ৭০ ভাগ শিশু এবং ম্যানিনজাইটিসে আক্রান্ত শতকরা ৭৮ ভাগ শিশুকে জীবাণুনাশক ওষুধ দেওয়া হয়েছে বলে তাদের অভিভাবকরা জানিয়েছেন। নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত যে ১৮ জন শিশুর রক্তে হিব জীবাণু পাওয়া গেছে, তাদের ১১ (৬১%) জন রক্ত সংগ্রহের আগেই জীবাণুনাশক ওষুধ গ্রহণ করেছে। নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত এবং জীবাণুনাশক ওষুধ গ্রহণকারী শিশুদের মধ্যে হিব সংক্রমণের হার ছিলো শতকরা ১ ভাগ। অন্যদিকে যেসব শিশু জীবাণুনাশক ওষুধ গ্রহণ করে নি তাদের মধ্যে হিব সংক্রমণের হার ছিলো শতকরা ১.৮ ভাগ। হিব ম্যানিনজাইটিসে আক্রান্ত ৩৫ জন শিশুর মধ্যে ৩০ (৮৫%) জনই তাদের রোগ পরীক্ষার আগেই জাবাণুনাশক ওষধ গহণ করেছে। ম্যানিনজাইটিসে আক্রান্ত এবং জীবাণুনাশক ওষুধ গ্রহণকারী শিশুদের মধ্যে হিব সংক্রমণের হার ছিলো শতকরা ১৪.৭ ভাগ। অন্যদিকে ম্যানিনজাইটিস রোগীদের মধ্যে যারা জীবাণুনাশক ওষুধ গ্রহণ করে নাই তাদের মধ্যে এ-হার ছিলো শতকরা ৮.৮ ভাগ।

ই-টেস্ট-এর মাধ্যমে ৪৯টি হিব জীবাণুর জীবাণুনাশক সংবেদনশীলতা পরীক্ষা করা হয়েছে। টাইমেথোপিম-সালফামেথোক্সাজোল, এ্যাম্পিসিলিন, কোরামফেনিকল এবং ইরিথোমাইসিনের জীবাণুনাশক সংবেদনশীলতা ছিলো সাধারাণভাবে নিম্নগামী। অন্যদিকে, সবগুলি জীবাণুই সিপ্রোফ্লোক্সাসিন এবং সেফট্রিআক্সোনে সংবেদনশীল ছিলো (সারণী ১)। ৪৯টি হিব জীবাণুর মধ্যে ১৬টি (৩২.৬%) ছিলো বহু ওষুধ-প্রতিরোধক (তিন বা ততোধিক)।

সারণী ১: ম্যানিনজাইটিস, নিউমোনিয়া এবং সেপ্টিসেমিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে হেমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জাই-এর জীবাণুনাশক ওষুধ-প্রতিরোধ ক্ষমতার ব্যাপ্তি

জীবাণুনাশক ওষুধ	*এইচ. ইনফ্লুয়েঞ্জাই* বি-এর ওষুধ-প্রতিরোধ ক্ষমতার শতকরা হার (মোট ৪৯টি জীবাণু)*		
	প্রতিরোধক	মাঝামাঝি প্রতিরোধী	সম্পূর্ণ সংবেদনশীল
এ্যাম্পিসিলিন	৩৫	৪	৬১
ক্লোরামফেনিকল	৩৭	২	৬১
টিএমপি-এসএমজেড	৫৭	০	৪৩
ইরিথ্রোমাইসিন	১.৪	৯৮.৬	০

*সবগুলো জীবাণুই সিপ্রোফ্লোক্সাসিন ও সেফট্রিআক্সোন-এ সংবেদনশীল ছিলো

তথ্যসূত্র: ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, স্যার সলিমুল্লাহ্ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা, বাংলাদেশ; ক্লিনিক্যাল সায়েন্সেস ডিভিশন, পাবলিক হেলথ্ সায়েন্সেস ডিভিশন এবং এ্যাকিউট রেসপিরেটরি ইনফেকশাস ল্যাবরেটরি, ল্যাবরেটরি সায়েন্সেস ডিভিশন, আইসিডিডিআর,বি

অর্থানুকূল্য: ইউনাইটেড স্টেটস্ এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট/ওয়াশিংটন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্তব্য

জনসংখ্যা-নির্ভর উপাত্ত যেখানে সহজলভ্য নয়, সেখানে আলোচ্য প্রতিবেদনের ফলাফলে দেখা যায় বাংলাদেশে ম্যানিনজাইটিস এবং নিউমোনিয়া রোগের অন্যতম কারণ হিব। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আগে-ভাগে জীবাণুনাশক ওষুধ ব্যবহারের ফলে অনেক রোগীর মধ্যেই আক্রমণাত্মক *এইচ. ইনফ্লুয়েঞ্জাই* লুক্কায়িত ছিলো। শিশুদের মধ্যে আক্রমণাত্মক *এইচ. ইনফ্লুয়েঞ্জাই* সংক্রমণের ক্ষেত্রে টাইপ বি জীবাণু ছিলো সবচেয়ে বেশি দায়ী। রক্ত সংগ্রহ ও তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষার পূর্বে ঘনঘন জীবাণুনাশক ওষুধ ব্যবহারের ফলে সম্ভবত আক্রমণাত্মক হিবজনিত রোগ নির্ধারণের ক্ষেত্রে রক্ত পরীক্ষার কার্যকারিতা কমে গেছে। মুখে খাওয়ার জীবাণুনাশক ওষুধের অস্থি-মজ্জার জীবাণুর ওপর প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা কম থাকে। আর সেজন্যে পূর্বেই জীবাণুনাশক ওষুধ গ্রহণকারী ম্যানিনজাইটিসে আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে হিব জীবাণুর যে উচ্চ হার দেখা গেছে তা সঠিক বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

আলোচ্য জীবাণুগুলির মধ্যে টাইমেথোপিম-সালফামেথোক্সাজোল, এ্যাম্পিসিলিন এবং ক্লোরামফেনিকল প্রতিরোধ করার উচ্চ ক্ষমতা পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে তৃতীয়-প্রজন্মের কোনো সেফালোসপোরিন-প্রতিরোধক পরিলক্ষিত হয় নি (এ-পর্যবেক্ষণের প্রতিনিধিত্বকারী ওষুধ ছিলো সেফট্রিআক্সোন)। এর ফলে বাংলাদেশে মারাত্মক *হেমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জাই* -জনিত রোগের (ম্যানিনজাইটিসের মত) চিকিৎসায় সেফট্রিআক্সোন ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

হিব-এর নানা প্রকার ওষুধ-প্রতিরোধক হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধির ফলে এর চিকিৎসার খরচ যেমন একদিকে বেড়ে যাচ্ছে, তেমনি এর চিকিৎসার ব্যর্থতাও বেড়ে যাচ্ছে। 'হিব কনজুগেট ভ্যাকসিন'—যার প্রয়োগ অন্যান্য দেশে হিব সংক্রমণের প্রভাব নাটকীয়ভাবে কমিয়ে এনেছে—তার প্রয়োগ বাংলাদেশেও সুফল বয়ে আনতে পারে, যদিও বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ায় হিব-এর প্রভাব ও প্রতিকারের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা দানের জন্য এ-অঞ্চলে এ-রোগের ফলে উদ্ভূত সমস্যা—সংক্রান্ত উপাত্ত প্রয়োজন। বেশিরভাগ হিব ম্যানিনজাইটিস এবং নিউমোনিয়া যেহেতু শিশুকালে অর্থাৎ ৪

থেকে ১২ মাস বয়সের মধ্যে ঘটে, সেহেতু টিকাদান কর্মসূচির আওতায় অন্যান্য টিকা দেওয়ার সময় (৬, ১০ এবং ১৪ সপ্তাহ বয়সে) হিব-এর টিকা দেওয়া সবচেয়ে ফলপ্রসু হতে পারে।

কক্সবাজার জেলার চকোরিয়ায় *প্লাসমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম*-এর ফলে ম্যালেরিয়া

কক্সবাজার জেলার চকোরিয়ায় ২০০২ সালের জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এলাকাভিত্তিক পর্যবেক্ষণে ৯৫ জন রোগী *প্লাসমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম* ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত বলে নিশ্চিতভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। তিনমাস সময়কালে এ-রোগে আক্রান্তের হার ছিলো প্রতি ১০০,০০০ লোকের মধ্যে ২,০২৫ জন। আক্রান্ত রোগীর প্রায় অর্ধেকের (৪৭.৪%) বয়স ছিলো ১৮ বছরের কম, যাদের মধ্যে আবার ১০.৫% ছিলো ৫ বছরের কম-বয়সের।

দক্ষিণ এশিয়ায় ম্যালেরিয়া একটি বড় ধরনের স্বাস্থ্যসমস্যা। নানারকম ওষুধের বিরুদ্ধে এ-রোগের প্রতিরোধ-ক্ষমতা বিস্তার লাভ করার ফলে অবস্থা আরো খারাপ হয়ে পড়েছে (১)। বাংলাদেশে *প্লাসমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম* দ্বারা সংঘটিত ম্যালেরিয়ার শতকরা ৯০ ভাগই দেশের উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এলাকার বনাঞ্চলসমৃদ্ধ ১৩টি জেলায় পরিলক্ষিত হয় (চিত্র ১)। প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ঘটনার খবর পাওয়া গেছে মাত্র চারটি জেলা থেকে। আনুমানিক ১ কোটি লোক ম্যালেরিয়া সংক্রমণের উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাস করছে (২)।

উচ্চ মাত্রার ম্যালেরিয়া-কবলিত এলাকায় এ-রোগের রোগতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের জন্য কক্সবাজার জেলার চকোরিয়া উপজেলার অন্তর্গত কাকারা ইউনিয়নে এক পর্যবেক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়, যেখানে 'চকোরিয়া কমিউনিটি হেলথ প্রজেক্ট' (সিসিএইচপি) নামে আইসিডিডিআর,বি-এর একটি প্রজেক্ট চালু আছে (৩)। এলাকাভিত্তিক স্বাবলম্বী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্যোন্নয়ন করা সিসিএইচপি-র মূল উদ্দেশ্য। সিসিএইচপি পার্শ্বমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করার জন্য এলাকাভিত্তিক সমন্বিত ব্যবস্থা চালু করতে সক্ষম হয়েছে এবং এটা সম্ভব হয়েছে মূলত প্রশিক্ষিত প্যারামেডিকদের দ্বারা।

উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাসকারী (একটি পার্বত্য এলাকার বনাঞ্চলের তিন কিলোমিটারের মধ্যে) ১২,৫৯০ জন লোকের প্রত্যেককে একটি করে সনাক্তকরণ নম্বর দেওয়া হয় এবং কারো জ্বর আছে কি না তা পর্যবেক্ষণের জন্য প্রত্যেকটি পরিবারকে প্রতি দু'সপ্তাহ অন্তর পরিদর্শন করা হয়। পর্যবেক্ষণ-এলাকায় একটি 'গ্রাম স্বাস্থ্য কেন্দ্র' আছে যেখানে তিনজন প্রশিক্ষিত প্যারামেডিক কাজ করে। এছাড়াও দু'টি নতুন প্রতিষ্ঠিত 'ম্যালেরিয়া কেন্দ্র' আছে যেখানে *পি. ফ্যালসিপেরাম* ৯০% সুক্ষ্মতায় সনাক্ত করা যেতে পারে। আর এজন্য র‍্যাপিড ডায়াগনস্টিক টেস্ট ব্যবহার করতে প্যারামেডিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে (প্যারাচেক ডিপস্টিক, অরকিড বায়োমেডিক্যাল, ইন্ডিয়া) (৪)।

নিম্নলিখিত যেকোনো একটি বিষয় পর্যালোচনা করে ক্লিনিক্যাল ম্যালেরিয়ার সংজ্ঞা নির্ধারণ করা যেতে পারে:

- রক্তের মধ্যে ম্যালেরিয়া পরজীবীর অবস্থান দেখে
- জ্বরের ইতিহাস ঘেটে
- ডাক্তার অথবা প্যারামেডিকের দেওয়া কমবেশি একটি ম্যালেরিয়া-নাশক ওষুধের ব্যবস্থাপত্র দেখে

ক্লিনিক্যাল ম্যালেরিয়ার উল্লিখিত সংজ্ঞার আওতাধীন রোগীর রক্ত পরীক্ষা করা হয়েছে প্যারাচেক ডিপস্টিকের মাধ্যমে। ২০০২ সালের জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১,৫৪৩ জন 'ক্লিনিক্যাল ম্যালেরিয়া'

চিত্র ১: বাংলাদেশে ম্যালেরিয়া-আক্রান্ত এলাকা

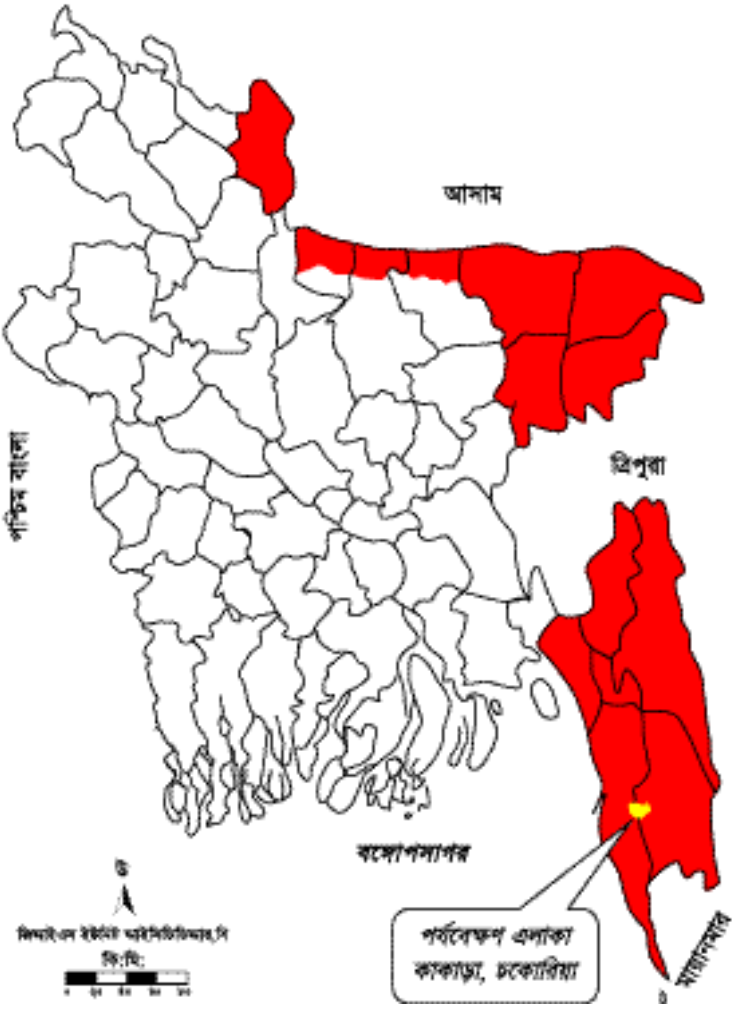

রোগী সনাক্ত করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ৫৭৫ জন হয় গ্রাম স্বাস্থ্য কেন্দ্রে অথবা ম্যালেরিয়া কেন্দ্রে এসেছে। ডিপস্টিক পদ্ধতিতে তাদের পরীক্ষা করা হয়েছে এবং ৯৫ (১৬.৫%) জনের মধ্যে *পি. ফ্যালসিপেরাম* সংক্রমণ আছে বলে নিশ্চিত করা হয়েছে। তিনদিনের একটি কুইনাইন কোর্স এবং এক ডোজ সালফাডোক্সাইন/প্রাইমিথামাইন দ্বারা সব রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছে।

নিশ্চিত বলে প্রতীয়মান *পি. ফ্যালসিপেরাম* ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত রোগীর অর্ধেকের (৪৭.৪%) বয়স ছিলো ১৮ বছরের কম (১০.৫% ছিলো ৫ বছরের কম-বয়সের শিশু)। তিনজন রোগী মারা গেছে। প্রমাণিত *পি. ফ্যালসিপেরাম* সংক্রমণ ঘটেছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জুলাই মাসে (চিত্র ২)। ক্লিনিক্যাল ম্যালেরিয়া রোগীর ১৬.৫ ভাগ *পি. ফ্যালসিপেরামে* আক্রান্ত হতে পারে মনে করে তিন মাসে *পি. ফ্যালসিপেরাম* ম্যালেরিয়ার আনুমানিক হার ছিলো ১০০,০০০ লোকের মধ্যে ২,০২৫ জন। (এটিকে ম্যালেরিয়া সংক্রমণের শীর্ষ ঋতু বলে গণ্য করা হয়েছে)

চিত্র ২: কক্সবাজার জেলার অধীনস্ত চকোরিয়া উপজেলার কাকারা ইউনিয়নে পি ফ্যালসিপেরাম জনিত ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ হার, জুন-সেপ্টেম্বর ২০০২

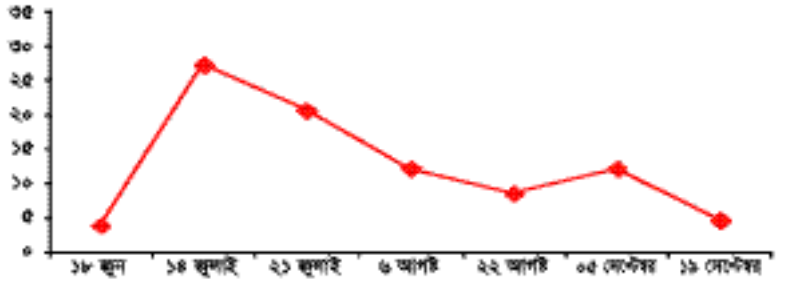

মোট ১৫ ঘন্টা সময়কালের বিভিন্ন সময়ে মানুষের শরীর থেকে মোট ৩১,০৫১টি মশা সংগ্রহ করা হয় । মোট ধৃত মশার ৩৭.০% ছিলো *এ্যানোফিলিস* প্রজাতির। বাকিগুলোর মধ্যে *কিউলেক্স* প্রজাতির মশা ছিলো সবচেয়ে বেশি (৫৭.৪%)। *এ্যানোফিলিসের* মধ্যে *এ্যানোফিলিস মিনিমাস* (*এন. মিনিমাস* ৫০%) এবং *এ্যান. ডাইরাস* (১৫%) সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে। সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১০টা এবং রাত ৪টা থেকে ভোর ৭টা পর্যন্ত দু'টি শীর্ষ সময়সহ পুরো সন্ধ্যা এবং রাত ধরে এ্যানোফিলাইন মশার কামড় লক্ষ করা গেছে।

তথ্যসূত্র: সোশাল এন্ড বিহ্যাভিয়ারাল সায়েন্সেস ইউনিট, পাবলিক হেলথ সায়েন্সেস ডিভিশন; প্যারাসাইটোলজি ল্যাবরেটরি, ল্যাবরেটরি সায়েন্সেস ডিভিশন এবং ইনফেকশাস ডিজিজেস ইউনিট, হেলথ সিস্টেমস্ এন্ড ইনফেকশাস ডিজিজেস ডিভিশন, আইসিডিডিআর,বি

অর্থানুকুল্য: ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি), যুক্তরাজ্য

মন্তব্য

আলোচ্য এলাকাভিত্তিক সমীক্ষার ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের ম্যালেরিয়া-প্রবণ এলাকায় *পি. ফ্যালাসিপেরাম* ম্যালেরিয়ার প্রকোপ উল্লেখযোগ্য। শিশুরা এ-রোগে ভীষণভাবে আক্রান্ত বলে প্রতীয়মান হয়। *'প্লাসমোডিয়াম ভাইভাক্স'*, (যা ম্যালেরিয়ার প্রকোপে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে) কিংবা অন্য কোনো পরজীবীজনিত ম্যালেরিয়ার প্রকোপের মাত্রা নির্ধারণ করতে আলোচ্য সমীক্ষা সমর্থ হয় নি। ম্যালেরিয়া-প্রবণ এলাকার লোকের স্বাস্থ্য পরীক্ষার মাধ্যমে ম্যালেরিয়া সনাক্ত করা এবং তা নিরাময়ে সর্বাধিক সম্ভব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে কি না তা যাচাই করা দরকার।

মশার কামড়ের আচরণগত উপাত্ত এর আগে খুব সীমিত ছিলো। প্রতিবেশী দেশগুলিতে *এন. মিনিমাস* এবং *এন. ডাইরাস* ছিলো প্রভাব বিস্তারকারী এ্যানোফিলিস মশা। যেসব মশার দ্বারা ম্যালেরিয়া রোগ ছড়ায় ম্যালেরিয়া-প্রতিরোধ কার্যক্রমের জন্য সেগুলো সম্বন্ধে ভালোভাবে জানার প্রয়োজন রয়েছে। *এন. মিনিমাস* এবং *এন. ডাইরাস* সন্ধ্যার শুরুতে এবং প্রত্যুষে কামড়ায়, যা আলোচ্য সমীক্ষা ও অন্যান্য গবেষণায় দেখা গেছে (৬)। অন্যদিকে আফ্রিকার সাব-সাহারা এলাকার অধিকাংশ দেশে *এন. গাম্বিয়াই সেনসু লাটো* নামক এক প্রকার মশার আহারের সময় মধ্য-রাত থেকে ভোর পর্যন্ত। এসব দেশে কীটনাশক প্রয়োগকৃত মশারী ব্যবহার করে এলাকাভিত্তিক রোগ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমসমূহ সফল হয়েছে বলে জানা যায় (৭)। দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহেও এধরনের কার্যক্রম কার্যকর হতে পারে যদি তারা তাদের এ-কার্যক্রমকে অন্যান্য রোগ নিয়ন্ত্রণ কৌশলসমূহের সাথে একীভূত করে, যেমন ম্যালেরিয়া-প্রবণ এলাকায় জটিল নয় এমন ম্যালেরিয়া দমনে প্রাথমিক পর্যায়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহনকারী মশক নিধন কার্যক্রম চালু করে। ১৯৯৪ সাল থেকে বাংলাদেশে ম্যালেরিয়ার জীবাণু-বাহক মশক নিয়ন্ত্রণের জন্য সীমিত আকারে দু'ধরনের কীটনাশক ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এগুলো হলো: ম্যালাথিয়ন ৫৭% ইসি ঘরের মধ্যে স্প্রে করে এবং ডেল্টামেথ্রিন ২.৫% ইসি মশারীতে ব্যবহার করে।

বাংলাদেশে ম্যালেরিয়া পরজীবীর ওষুধ-প্রতিরোধ ক্ষমতা ক্রমশ বাড়ছে (৭-৮)। প্রচলিত জাতীয় নীতিমালা অনুযায়ী *পি. ফ্যালসিপেরাম* এবং *পি. ভাইভাক্স* দ্বারা সৃষ্ট জটিল নয় এমন ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা করা হয় ক্লোরোকুইনের তিন-দিনের একটি কোর্স (রোগীর শরীরের ওজনের প্রতি কেজির জন্য ২৫ মি:গ্রা: হিসেবে) এবং তারপর প্রাইমাকুইনের একটি মাত্র ডোজ দিয়ে (বয়স্কদের জন্য ৪৫ মি:গ্রা:)। মারাত্মক ম্যালেরিয়া রোগের চিকিৎসায় সব রোগীর ক্ষেত্রে প্যারেন্টাল কুইনাইন (রোগীর শরীরের ওজনের প্রতি কেজির জন্য ১০ মি:গ্রা: কুইনাইন ডাই-হাইড্রোক্লোরাইড) কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। মহামারীর সময় মারাত্মক ম্যালেরিয়া রোগী সনাক্ত করে তাদের প্রত্যেককে হাসপাতালে পাঠানোর পূর্বে ১ ডোজ করে কুইনাইন ইনজেকশন (আইএম) দেওয়ার জন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

কক্সবাজার জেলার রামু নামক স্থানে ১৯৯৭ সালে পরিচালিত ২৮ দিনব্যাপী এক পরীক্ষা কার্যক্রমে ১২-৬০ বছর বয়সী রোগীদের ক্ষেত্রে ক্লোরোকুইন দ্বারা চিকিৎসায় শতকরা ৫৬ ভাগ ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়েছে (৯)। একই স্থানে কুইনাইনের তিনটি এবং সালফাডোক্সিন/প্রাইমিথামাইন-এর একটি ডোজের অন্য এক চিকিৎসায়ও শতকরা ২১ ভাগ ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়েছে (৯৫% নির্ভরযোগ্যতা, ১৫-২৯%)।

ম্যালেরিয়া এবং দরিদ্রতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বলে ধারণা করা হয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠি ম্যালেরিয়ার উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে অবস্থিত হওয়ার ফলে এ-রোগ অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ ক'রে দরিদ্রতা টিকিয়ে রাখতে সক্ষম (১০)। বাংলাদেশে স্বাস্থ্যোন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে ম্যালেরিয়া এক বিশাল হুমকিস্বরূপ।

আইসিডিডিআর,বি ২০০৩ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশের কতিপয় ম্যালেরিয়া-প্রবণ এলাকায় ওষুধ-প্রতিরোধী ম্যালেরিয়ার ওপর এক পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম শুরু করেছে। রোগীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সাথে পরীক্ষাগারে ওষুধ-প্রতিরোধ ক্ষমতার পরীক্ষার ফলাফলের তুলনা করা হবে। আলোচ্য সমীক্ষার ফলাফল ম্যালেরিয়া রোগের চিকিৎসায় সর্বোচ্চ ফল লাভের জন্য এবং ম্যালেরিয়াজনিত স্বাস্থ্যসমস্যা নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় কলা-কৌশল নির্ধারণে সাহায্য করবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র 'রোল ব্যাক ম্যালেরিয়া টেকনিক্যাল সাপোর্ট নেটওয়ার্ক'-এ বাংলাদেশ দক্ষিণ-

পূর্ব এশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করছে এবং এ-দেশে সংক্রমণের ঝুঁকি হ্রাসকরণ (টিআরআর), ওষুধ-প্রতিরোধ নীতিমালা (ডিআরপি) এবং পর্যবেক্ষণ, তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং মহামারী মোকাবেলার প্রস্তুতি ও তাতে সাড়া দেওয়া-সংক্রান্ত জাতীয় প্রচেষ্টার রূপরেখা তৈরির কাজ এগিয়ে চলেছে।

বি:দ্র: তথ্যনির্দেশের জন্য ইংরেজি সংস্করণ দেখুন

সতর্কবার্তাঃ নানা প্রকার ওষুধ-প্রতিরোধী *শিগেলা ডিসেন্টারী* টাইপ ১ যদি সিপ্রোফ্লোক্সাসিন প্রতিরোধী হয়ে ওঠে, তাহলে বাংলাদেশে রক্ত আমাশয় মহামারী আকারে দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা

শিগেলা ডিসেন্টারী টাইপ ১ (এসডি১) জীবাণুর ফলে ১৯৭৩ সাল থেকে প্রতি দশ বছর অন্তর দক্ষিণ এশিয়ায় একবার রক্ত আমাশয় মহামারী দেখা দিয়েছে (১)। অতি সম্প্রতি ১৯৯৪-১৯৯৫ সালে এ-মহামারী সংঘটিত হয়েছে। এসডি১জনিত মহামারী খুব ভয়ংকর হতে পারে, যার ফলে মৃত্যুহার অনেক বেড়ে যেতে পারে, বিশেষ করে পুষ্টিহীন শিশুদের বেলায়।

১৯৮৪ সালের মহামারীতে এসডি১ সংক্রমণে ১ থেকে ৪ বছর-বয়সী শিশুদের মৃত্যুহার শতকরা ৪২ ভাগে উন্নীত হয়েছিলো (২)। প্রত্যেক মহামারীর সময় নতুন কোনো জীবাণুর উত্থান ঘটে, যা পূর্বে কার্যকর জীবাণুনাশককে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখে (৩)। এভাবে বেশিরভাগ এসডি১ জীবাণু এ্যাম্পিসিলিন, ক্লোরামফেনিকল, কোট্রিমোক্সাজোল এবং ন্যালিডিক্সিক এসিড-প্রতিরোধক হয়ে পড়েছে। অথচ এসব ওষুধ অতি সাম্প্রতিক কালেও খুব কার্যকর ছিলো। অন্যান্য আন্ত্রিক জীবা থেকে এসডি১ যেহেতু বেশি দ্রুত রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে বলে মনে হয়, সেহেতু এটা উদ্বেগের বিষয় যে, পরবর্তী আমাশয় মহামারী এসডি১-এর নতুন কোনো প্রজাতি দ্বারা সংঘটিত হতে পারে, যা সিপ্রোফ্লোক্সাসিন-প্রতিরোধক। যদি এসডি১ সিপ্রোফ্লোক্সাসিন এবং নরফ্লোক্সাসিন-প্রতিরোধক হয়েই যায়, তবে এ-রোগের চিকিৎসা আরও জটিল হয়ে পড়বে, কারণ খুব কম ওষুধই তখন কার্যকর থাকবে।

এসডি১ সিপোফোক্সাসিন-পতিরোধী হওয়ার ফলে গত বছর কোলকাতা, শিলিগুড়ি এবং আইজওয়ালসহ পূর্ব-ভারতে আমাশয়ের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে (৪)। তখন মে-জুন মাসে বাংলাদেশের মতলব এবং ঢাকা থেকেও অসুস্থ রোগীদের মধ্যে একই ধরনের জীবাণু সনাক্ত করা হয়েছে। সবগুলি জীবাণুই এ্যাম্পিসিলিন, সিপ্রোফ্লোক্সাসিন (মিনিমাম ইনহিবিটরি কনসেনট্রেশন=৬-২৪ মা:গা:/মি:লি:), নরফোক্সাসিন (মিনিমাম ইনহিবিটরি কনসেনটেশন=২-৬ মা:গা:/মি:লি:), কোটিমোক্সাজোল, ন্যালিডিক্সিক এসিড এবং টেটাসাইকিন-পতিরোধক ছিলো; শুধমাত্র এজিথ্রোমাইসিন, সেফট্রিআক্সোন, পিভমেসিলিনাম এবং অফ্লোক্সাসিনের প্রতি সংবেদনশীল বলে পরিলক্ষিত হয়েছে।

দশ বছর পর পর এসডি১ মহামারীর বিগত চক্রগুলো দেখে, সর্বশেষ দশ বছর পূর্বে সংঘটিত মহামারীর অভিজ্ঞতা থেকে এবং অতি সম্প্রতি উল্লিখিত ওষুধ-প্রতিরোধী জীবাণু দ্বারা সংঘটিত রোগের ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করে বোঝা যায়, অদূর ভবিষ্যতে আরো একটি মহামারীর সম্ভাবনা উজ্জ্বল। আমাশয় মহামারী এবং এসডি১ সংক্রমণ (যা হেমোলাইটিক-ইউরেমিক সিনড্রোমসহ নান ধরনের জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে) বিষয়ে স্বাস্থ্য-সুবিধা প্রদানকারীদের এখনই সতর্ক হয়ে যাওয়া উচিত, কারণ এসডি১ জীবাণু সচরাচর ব্যবহৃত অনেকগুলো জীবণুনাশক ওষুধ-প্রতিরোধী হয়ে

দাঁড়িয়েছে। দ্রুত এসডি১ সংক্রমণ সনাক্ত করার লক্ষ্যে একটি নতুন রোগ-নির্ণায়ক পরীক্ষা উদ্ভাবনের জন্য আইসিডিডিআর,বি-তে গবেষণা চলছে। আশা করা যায়: এসডি১জনিত রোগ এবং এর প্রাদুর্ভাব নির্ণয়ে এ'টি কার্যকর হবে। জনস্বাস্থ্যের ওপর মহামারীর প্রভাব ন্যূনতম পর্যায়ে রাখার জন্য ব্যক্তিগত পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং নিরাপদ পানি ব্যবহারের গুরুত্বসহ জনস্বাস্থ্য কার্যক্রমসমূহকে আরো উন্নত করতে হবে। ওষুধ-প্রতিরোধক জীবাণুর ক্ষেত্রে যে জীবাণুনাশক বর্তমানে ব্যবহার করা হচ্ছে তা হলো পিভমেসিলিনাম (৫)। তবে বিকল্প ওষুধ আবিষ্কারের জন্য আরও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

বি:দ্র: তথ্যনির্দেশের জন্য ইংরেজি সংস্করণ দেখুন

সর্বশেষ পর্যবেক্ষণ

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা'র প্রতিসংখ্যায় পূর্ববর্তী সংখ্যায় প্রদত্ত পর্যবেক্ষণ-বিষয়ক উপাত্তের হালনাগাদ তথ্য পরিবেশন করা হয়। এই হালনাগাদকৃত সারণী এবং চিত্রগুলোতে প্রকাশনাকালীন সময়ে প্রাপ্ত সর্বশেষ পর্যবেক্ষণ কর্মসূচির তথ্যগুলো প্রতিফলিত হবে। আমরা আশা করছি, রোগ বিস্তারের বর্তমান ধরন এবং রোগের ওষুধ প্রতিরোধ সম্পর্কে আগ্রহী স্বাস্থ্যগবেষকদের কাছে এই তথ্যগুলো সহায়ক হবে।

জীবাণুনাশক ওষধের প্রতি ডায়রিয়া জীবাণুর (%) সংবেদনশীলতা: জানুয়ারি–জুন ২০০৩

জীবাণুনাশক ওষুধ	*শিগেলা* (সর্বমোট ১৪২)	*ভি. কলেরি ০১* (সর্বমোট ২৩৩)	*ভি. কলেরি ০১৩৯* (সর্বমোট ২১)
ন্যালিডিক্সিক এসিড	৩৯.৪	পরীক্ষা করা হয় নি	পরীক্ষা করা হয় নি
মেসিলিন্যাম	৯৯.৩	পরীক্ষা করা হয় নি	পরীক্ষা করা হয় নি
এ্যাম্পিসিলিন	৪৮.৬	পরীক্ষা করা হয় নি	পরীক্ষা করা হয় নি
টিএমপি-এসএমএক্স	৪১.৫	১.৩	১০০
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	৯৯.৩	১০০	১০০
টেট্রাসাইক্লিন	পরীক্ষা করা হয় নি	১০০	১০০
এরিথ্রোমাইসিন	পরীক্ষা করা হয় নি	১০০	১০০
ফুরাজোলিডিন	পরীক্ষা করা হয় নি	০.০	১০০

প্রতিমাসে প্রাপ্ত ভি. কলেরি *০১*, ভি. কলেরি *০১৩৯*, শিগেলা *এবং রোটাভাইরাসের তুলনামূলক চিত্র: জানুয়ারি-জুন ২০০৩*

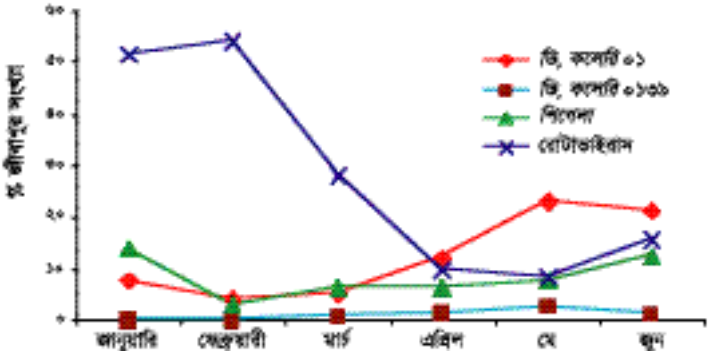

১৩৫টি এম. টিউবারকিউলোসিস *জীবাণুর ওষুধের প্রতি প্রতিরোধের ধরন: আগষ্ট ২০০২-মে ২০০৩*

ওষুধ	প্রতিরোধের ধরন প্রাইমারী (সর্বমোট ১০৫)	 একোয়ার্ড (সর্বমোট ৩০)*	 মোট (সর্বমোট ১৩৫)
স্ট্রেপটোমাইসিন	৫০ (৪৭.৬)	১৮ (৬০.০)	৬৮ (৫০.৪)
আইসোনায়াজিড (আইএনএইচ)	১৪ (১৩.৩)	৭ (২৩.৩)	২১ (১৫.৬)
ইথামবিউটল	৫ (৪.৮)	৭ (২৩.৩)	১২ (৮.৯)
রিফামপিসিন	৪ (৩.৮)	৪ (১৩.৩)	৮ (৫.৯)
এমডিআর (আইএনএইচ+রিফামপিসিন)	৪ (৩.৮)	৪ (১৩.৩)	৮ (৫.৯)
অন্যান্য ওষুধ	৫২ (৪৯.৫)	১৮ (৬০.০)	৭০ (৫১.৯)

( ) শতকরা হার
*১ মাস বা তার বেশি যক্ষার ওষুধ গ্রহণ করেছে

জীবাণুনাশক ওষুধের প্রতি এন. গনোরিয়া জীবাণুর (%) সংবেদনশীলতা: মে-জুলাই ২০০৩ (সংখ্যা=১০৬)

জীবাণুনাশক ওষুধ	সংবেদনশীল (%)	মাঝামাঝি কার্যকর (%)	রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা (%)
এজিথ্রোমাইসিন	৮৪.০	১৬.০	০.০
সেফিক্সিম	১০০.০	০.০	০.০
সেফট্রিয়াক্সোন	৯৯.১	০.৯	০.০
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	২.৮	১.৯	৯৫.৩
পেনিসিলিন	৫.৭	৩৯.৬	৫৪.৭
স্পেক্টিনোমাইসিন	৯৯.১	০.০	০.৯
টেট্রাসাইক্লিন	০.৯	১২.৩	৮৬.৮

উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বাস্থ্যসমস্যা নিরসনে আইসিডিডিআর,বির অংগীকারের সাথে সহমর্মী দেশ ও সংস্থাগুলোর কাছ থেকে আইসিডিডিআর,বি অবারিতভাবে আর্থিক সহায়তা পেয়ে আসছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, বেলজিয়াম, কানাডা, জাপান, হল্যান্ড, সুইডেন, শ্রীলংকা, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সাহায্য সংস্থা।

সম্পাদকমন্ডলি: রবার্ট ব্রাইম্যান এবং পিটার থর্প
সম্পাদনা বোর্ড: বরকত-এ-খোদা এবং চার্লস লারসন
কপি সম্পাদক ও বাংলা অনুবাদক: সিরাজুল ইসলাম মোল্লা
বাংলা সম্পাদনা: এম এ রহীম ও সিরাজুল ইসলাম মোল্লা
বাংলা ডেস্কটপ পাবলিশিং: মোঃ মাহবুব-উল-আলম

আইসিডিডিআর,বি: সেন্টার ফর হেলথ্ এ্যান্ড পপুলেশন রিসার্চ
ডিপিও বক্স নং ১২৮
ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
www.icddrb.org

ঘোষণা

৭-৯ ডিসেম্বর ২০০৩

টেন্‌থ্ এশিয়ান কনফারেন্স অন ডায়রিয়াল ডিজিজ এ্যান্ড নিউট্রিশন

উদরাময় রোগ এবং পুষ্টিসম্পর্কিত ১০ম এশীয় সম্মেলন (ASCODD) ঢাকাতে অনুষ্ঠিত হবে। এবারের সম্মেলনের প্রতিপাদ্য বিষয় হবে "শিশু-স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ও পুষ্টি"। এতদ-সংক্রান্ত আরও তথ্য http://www.icddrb.org/enrollment/?type=Ascodd ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

যদি আপনি সম্মেলন সংগঠকদের সাথে যোগাযোগ করতে চান অথবা আরো কোনো তথ্যের প্রয়োজন হয়, তাহলে ascodd@icddrb.org-এ ঠিকানায় ইমেইল করুন কিংবা চিঠি লিখুন এই ঠিকানায়ঃ ASCODD 10, ICDDRB, GPO Box 128, Dhaka 1000, Bangladesh.